হত্যা নগরের গোলকধাঁধা

সিতম চক্রবর্তী

বইবন্ধু

'রহমান ভাইয়া।'

'ও রহমান ভাইয়া, ওঠো ওঠো আর কত পড়ে পড়ে ঘুমোবে!'

ঘুম জড়ানো চোখে উঠে বসে রহমান বলল, 'এই একটু চোখ লেগে গিয়েছিল, রাত তো আর কম হল না।'

'সবে সাড়ে-এগারোটা বাজে।' বলেই রহমানের কালি-পিলি মানে মুম্বাই-এর বিখ্যাত কালো-হলুদ ট্যাক্সিতে উঠে বসল জ্যানেট।

ড্রাইভারের পুশব্যাক সিটটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দে সোজা করে উঠে বসল রহমান।

'বাড়ি যাবি তো?'

'হুম, রোজকার মতন মাদার মেরিকে হ্যালো বলে বাড়ি যাব। আর কোথায় যাব বলো তো ভাইয়া, বুড়ো বিল ছাড়া আমার আর আছেটাই-বা কে!'

'সে তো আমারও কেউ নেই, এটাই তো জীবন রে।'

'তোমার কেউ নেই? এটাও শুনতে হবে আমাকে! মর্জিনা তাহলে কে হয় ভাইয়া?' বলেই মুচকি মুচকি হাসতে লাগল জ্যানেট।

'ওই আরকি। নিকাহ্ তো আর হয়নি।'

'তবে তোমার ড্যান্সবারে যাওয়ার অভ্যাস, জুয়া খেলার অভ্যাস এগুলো তো ছাড়িয়েছে, সেটা তো মানতেই হবে।'

একটু মুচকি হেসে চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে তারপর গাড়ি ছাড়ে রহমান।

লীলাবতী হাসপাতালে নার্সের কাজ করে জ্যানেট। কেরালায় বাড়ি হলেও বছর চারেক ধরে থাকে ধারাভির বস্তিতে। এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো বস্তি। শিফট শেষ করে বের হয়ে রহমানের ট্যাক্সিতেই প্রায় রোজ বাড়ি ফেরে। সকালে অবশ্য বিইএসটি-এর বাস ধরেই আসে। বাড়ি ফেরার পথে লেডি অফ দ্য মাউন্ট ব্যাসিলিকাতে মাদার মেরির পায়ের কাছে একটা গোলাপ রেখে তারপর বস্তিতে ফেরে, একটু ঘুরপথ হয় ঠিকই, তবে রহমান ভাইয়া টাকা নেয় না।

টাকা দিতে গেলেই বলে, 'আমাদের চলের (বস্তির সস্তার তিন-তলা ফ্ল্যাট

বাড়ি) কারও কাছ থেকে টাকা নিতে দেখেছিস কখনও? যেদিন তোর অনেক টাকা হবে, বস্তি ছেড়ে চলে যাবি ভালো কোনো জায়গায়, সেদিন দিয়ে দিস।'

কথায় কথায় চার্চের সামনে পৌঁছে যায় গাড়ি। জ্যানেট চলে গেলে রেডিয়ো চালাল রহমান। এসব জায়গায় গাড়ি পার্কিং এর অসুবিধে হয়, তাই গাড়ির ইঞ্জিন চালু অবস্থাতেই রাখতে হয়। হঠাৎ করেই বিকট শব্দ করে দুটো বাইক এসে দাঁড়াল পাশে। দুটো বাইকে মোট চারটা লোক। তাদের মধ্যে থেকে একজন নেমে এসে রহমানের জানালায় টোকা মারল। ইশারায় নেমে আসতে বলল ওকে। চোস্ত কালো কুর্তা পাজামা আর মাথায় হেলমেট, পোশাক দেখেই রহমান বুঝতে পেরেছে ওরা কার লোক। মালিকভাই লোক পাঠিয়েছে।

'কী হল, নেমে আয়। মালিকভাইয়ের টাকা হজম করে দেওয়া কি মুখের কথা নাকি! মাটির নীচে লুকিয়ে থাকলেও খুঁজে নেব আমরা।'

'টাকাটা আমি দিয়ে দেব ভাই। একটু সময় দরকার।'

'সময়! আর কত সময় নিবি শালা? অলরেডি তিনটে ডেট ফেল করেছিস। ফোন তুলছিস না। এড়িয়ে যাচ্ছিস।' এসব বলতে বলতেই পেটে একটা ঘুসি মারল। ওঁক করে একটা শব্দ করে রহমান বসে পড়ল মাটিতে।

'শোন আর তিন দিন সময় দিলাম, পুলিশের কাছে গেলে কী হবে সেটা নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না। সুদ সমেত এবার দশ লাখ টাকা লাগবে।'

'এত টাকা আমি কোথায় পাব? চার লাখ দেওয়ার কথা ছিল তো।'

'সে তো ছিলই। যদি সময়ে দিতিস তবে। এখন দশ লাখ লাগবে। নাহলে তোর চোখ আর কিডনি দুটো আমরা বেচে টাকা তুলে নেব।'

'মনে থাকে যেন, তিন দিন মাত্র সময়।'

বাইক দুটো যেমন বিকট শব্দ করে এসেছিল সেরকমভাবেই চলে গেল। পুরো ঘটনাটা ঘটতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। ঘুসিটা বেশ জোরেই পড়েছে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রহমান। উঠেই দেখল জ্যানেট ফিরে এসেছে।

'এসব কারবারে থাকো কেন?'

'ও কিছু না। টাকা পায় আমার কাছে।'

'সে তো শুনলাম। দশ লাখ টাকা চাইল। অত টাকা তোমার আছে? দেবে কী করে?'

'ও কিছু একটা ভেবে নেব। টাকাটা টি-২০তে লাগিয়েছিলাম।'

কথাটা শেষ করার আগেই জ্যানেট বলল, 'বেটিং!! হেরেছ নিশ্চয়ই।'

'ঠিক হেরেছি বলা যাবে না।'

'তাহলে?'

'আসলে রবিবার দুটো ম্যাচ থাকে, আমি প্রথমটায় লাগাতে বলেছিলাম ওরা দ্বিতীয়টায় লাগিয়েছে। এটায় জিতে যেতাম প্রায় বিশ লাখ টাকা, ওতে হেরে গেলাম পাঁচ লাখ।'

'কিন্তু ওরা যে বলল চার।'

'ওদের চার আর আমার এক।'

'কিন্তু এই গন্ডগোলের কথাটা মালিকভাইয়ের ছেলেগুলোকে বলছ না কেন?'

'বলে কোনো লাভ নেই, এই খেলায় মালিক চুনোপুঁটি। বেটিং-এর গেমটা কন্ট্রোল করে গোয়ার কোনো এক বিশাল ডন। এরা ওরকমভাবেই লোককে চুনা লাগায়।'

'এই জন্য তো বলি মর্জিনাকে বিয়ে করে সেটল করে যাও।'

'মর্জিনার বস্ আদিল ছাড়বে তবে তো।'

আর কিছু বলার আগেই ফোনটা বেজে উঠল। আননোন নম্বর।

'হ্যালো!'

...

'হ্যাঁ বলছি।'

...

'কে?'

...

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তা এটা কী নতুন নম্বর নাকি?'

...

'কোন ট্রেনে?'

...

'তাহলে সিএসটি গিয়ে লাভ নেই, দাদার সেন্ট্রালেই নেমে পড়। আমি গাড়ি নিয়ে থাকব।'

...

'থানে থেকে আধ ঘণ্টা নেবেই, তার মধ্যে আমি ঢুকে যাব।'

উৎসুকভাবে জ্যানেট তাকাচ্ছে দেখে রহমান বলল, 'আমার এক খালাতো ভাই আসছে, কিছুদিন থাকবে মুম্বাইয়ে।'

'কী করে তোমার ভাই?'

'ও বিদেশে কাজ করত, দেশে ফিরেছে। হয়তো ঘুরতে আসছে মুম্বাই।'

'বিদেশ থেকে আসছে? বিরাট বড়োলোক নাকি?'

'বলা যায় না। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই তো। ই-মেল, হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয় মাঝে মধ্যে। তাই চেহারাটা চিনি।'

'যাক তাহলে খুঁজে বেড়াতে হবে না।'

'তোর একটু দেরি হলে অসুবিধা নেই তো?'

'না না কীসের অসুবিধা। এ শহরটা রাতে ঘুমায় নাকি! তাছাড়া কাল আমার নাইট শিফট আছে।'

'চল তাহলে নোমানকে তুলে নিয়ে একবারেই যাব।'

'বাহ্ নামটা তো বেশ। নো-ম্যান।'

ঘড়ি দেখে জ্যানেট বলল, 'আমরাও পৌঁছাব আর ট্রেনও ঢুকবে।'

জ্যানেট উঠতেই গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে।

'আজও কি হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে খাবার চুরি করেছিস? নাকি রাস্তায় কোথাও খাবার কিনবি?'

'না খাবার নিয়ে নিয়েছি। সমুদ্রের থেকে এক মগ জল বের করে নেওয়ার মতো ব্যাপার। প্রচুর টাকা ওদের, এসব ব্যাপারে নজর দেয় না।'

'ধরা পড়লে বুঝবি। হ্যাঁ রে, ওদের সিসিটিভি নেই?'

'আছে তো, কিন্তু আমরা চালাকি করে ব্লাইন্ড স্পটগুলো বের করে ফেলেছি।'

'তোমার তো সাতটা ট্যাক্সি রয়েছে। অন্য ছ-টা অ্যাপ ক্যাবে চালাও, ড্রাইভারও রেখেছ, তাও নিজে এই পুরানোটা চালাও কেন?'

'আর কোথায় নিজে চালাই, সকালে এক-দুটো ট্রিপ করি, সারাদিন ওই অ্যাপ ক্যাবের কাস্টমারদের ম্যানেজ করি আর রাতে তোকে তুলতে আসি।'

'আমি কি কোনো সেলিব্রিটি নাকি?'

'বস্তির সবাই না-হেল্প করলে আমার অ্যাপ ক্যাবের বিজনেসটা কী করে দাঁড় করাতাম বল তো?'

'তাই বলে রোজ পিক্-আপ করতে হবে? এতটাও ঋণ নেই তোমার ওপর।'

'না রে, দিনকাল বড্ড খারাপ। দেখলি-না একটু আগেই কী হল। সেইজন্য রাতে আসি পিক্-আপ করতে, সকালে ছাড়তে আসি কি?'

'এই যে বলছিলে সকালে নিজে কাকে নিয়ে যাও, কাকে নিয়ে যাও বলো তো? আমাদের চলের কেউ?'

'আমাদের চলের নয়, তবে বস্তির।'

'কে? আমি চিনি?'

'হুম। সবাই চেনে। ইয়াকুব।'

'ওই গাঁজাড়িটা?'

'হুম। তবে মনের দিক থেকে খুব ভালো।'

এসব কথা বলতে বলতেই দাদার সেন্ট্রালে পৌঁছে গেল ওরা। ট্রেন ঢুকে গেছে, লোকজন বেরোচ্ছে।

প্রায় ছ-ফুটের ওপর লম্বা, ভদ্র চেহারার পিঠে রুকস্যাক নেওয়া চাপদাড়িওয়ালা একজন হঠাৎ করেই এসে গাড়ির ভেতরে উঁকি মেরে পিছনের সিটে জ্যানেটকে দেখে সামনের দরজা খুলে রহমানের পাশে ব্যাগটা কোলে নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'চলো।'

রহমান একটু অবাক হয়েই বলল, 'তুমি গাড়িটা চিনলে কেমন করে? বেশ ভালোই ভিড় রয়েছে তো।'

'আমি ফুট ওভারব্রিজের ওপর থেকে নজর রাখছিলাম, গাড়ির নম্বরটা তোমার হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি থেকে পাওয়া। নাও এবার চলো, বড্ড টায়ার্ড আমি, একটু ঘুম দরকার।'

'রাতে খাবে না?'

'না। ট্রেনে বিরিয়ানি খেয়ে নিয়েছি।'

'সিটবেল্ট লাগিয়ে নাও।' বলে গাড়ি স্টার্ট করল রহমান।

সিটবেল্ট লাগাতে লাগাতেই লুক ব্যাক মিররে জ্যানেটকে দেখছিল নোমান।

জ্যানেট সেটা লক্ষ করে একটু অস্বস্তিতে পড়ে নিজে থেকেই বলল, 'হাই, আমি জ্যানেট। রহমান ভাইয়া আগে যে চলে থাকত, সেখানেই থাকি।'

'হাই, আমি নোমান জাভেদ।' আমি রহমানের খালাতো ভাই হই।' বেশ ভদ্রভাবেই কথাটা বললেও লোকটার হিন্দিতে একটু অন্যরকম টান রয়েছে সেটা খেয়াল করল জ্যানেট।

'ঠিক আছে, আপনি আজ টায়ার্ড রয়েছেন, রেস্ট করুন, কাল কথা হবে।'

'আপনি আমাকে রহমানের মতোই স্বচ্ছন্দে তুমি বলতে পারেন, ও যদি দাদা হয় তাহলে আমিও দাদাই হব।'

একটু হেসে জ্যানেট বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

বস্তিতে ঢুকে নোমানকে দাঁড়াতে বলে জ্যানেটকে নামাতে গেল। চলের সামনের জায়গাটায় পিঠে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বস্তির ছেলেগুলোর নাইট ক্রিকেট দেখতে দেখতে অস্ফুটে বলেই ফেলল নোমান, 'এ শহরটা সত্যিই রাতে ঘুমোয় না।'

ফেরার সময় গাড়িটা কোথাও পার্ক করে পায়ে হেঁটেই ফিরল রহমান।

বলল, 'চল ভাই এবার আমার তাজমহলে।'

'তাজমহল?'

বস্তি আর চল দুটোর মাঝখানে একটা দু-কামরার বাংলো টাইপ একতলা বাড়ি, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, তাতে দু-পাশে তিনটে করে মোট ছ-টা ট্যাক্সি পার্ক করা। বিভিন্ন গাড়িতে বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাবের লোগো সাঁটা রয়েছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা চিমসে গন্ধ নাকে এল। নোমান বুঝতে পারল বেশ কিছুদিন পরিস্কার না-হলে এরকম হয়। সে যাই হোক, এটাই আপাতত তার ঠিকানা।

।। দুই ।।

'নোমান, এই নোমান। উঠে পড় ভাই।'

রহমানের ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নোমান।

'কী হল, ভয় পেয়েছিলি নাকি?'

'না। ভয় পাব কেন?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল নোমান।

'তোর ব্যাপারটা কী বল তো? শেষ পাঁচ বছর কোনো যোগাযোগ নেই।'

'সব বলব বলেই তো এখানে আসা। তার আগে একটু চা খাওয়াতে পারো?'

'হুম। কেন পারব না? আমি তো নিজেই চা করে খাই। দাঁড়া আনছি রান্নাঘর থেকে।'

চা নিয়ে এসে রহমান বসল বিছানায়।

এটা সিঙ্গেল বিছানা। রহমানের রুমেরটা ডবল।

'এবার বল তো, হঠাৎ করেই এলি। হাবভাব তো খুব একটা ভালো ঠেকছে না। কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে এসেছিস নাকি?'

চুপচাপ হয়ে গেল নোমান, কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না দেখে রহমান বলল, 'সেরকম কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার হলে বলার দরকার নেই। আমি তোর সম্পর্কে তো বিশেষ কিছুই জানি না। খালা মারা যাওয়ার আগে শুধু তোর মোবাইল নম্বরটা আমায় দিয়ে বলেছিল যোগাযোগ রাখতে। সেটা যে ভারতীয় নম্বর নয় তা জানতাম। বিদেশে ফোন করব, কোন দেশে আছিস সেখানে দিন না রাত কিছুই তো জানি না, তাই ভয়ে ফোনই করিনি। তাই কোনোদিন কথাও হয়নি আমাদের, শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপেই হাই-হ্যালো হত। তারপর তো কোথায় চলে গেলি কে জানে? হোয়াটসঅ্যাপেও আর যোগাযোগ হত না। লাস্ট সিন তো মনে হয় বছর পাঁচেক আগের। সেই ছোটোবেলায় মাকে হারিয়েছি। আব্বুর কাজের ধরনের সঙ্গে নিজেকে খুব একটা মেলাতে পারিনি কোনোদিনই। তাই একাই একটু একটু করে খেটে এই ট্যাক্সির ব্যাবসাটাকে দাঁড় করিয়েছি।' একটানা নোমানের মুখের দিকে

তাকিয়ে কথাগুলো বলে থামল রহমান। চায়ে চুমুক দিল।

নোমান বলল, 'বছর দশেক আগে ঠিক করি ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দেব, বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যাই ওড়িশার বেরহামপুরে। ওখানে একজন কোচিং করান। ফিল্ড কোচিং নি, সঙ্গে টুকটাক লোকাল কাজটাজও করতাম। রাতে থাকতাম এক মাস্টারের ঘরে, উনি এক্স আর্মি। উনি সাবজেক্ট আর ইংরেজি পড়াতেন। আমি বরাবর ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্র, পড়াশোনাতেও খুব একটা খারাপ ছেলে ছিলাম না। সেকেন্ড চান্সেই এসএসবি ক্লিয়ার করলাম।'

'তাহলে তুই আর্মিতে ছিলি?'

'না। রিটেন আর মাঠ দুটো ক্লিয়ার করলেও আকাদেমি পর্যন্ত আর পৌঁছাতে পারিনি।'

'কেন?'

'বেরহামপুর থেকে সবচেয়ে কাছের যে সি-বিচ ওখানেই ওই একটা সরকারি স্কুলে কাজ করতেন মাস্টারমশাই। আমাকে ওই স্কুলেই তাইকোন্ড শেখানোর জন্য টেম্পোরারি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর এক ছাত্র বেরহামপুরে কোচিং চালান। সকাল হলেই বাইক নিয়ে কোচিং, বিকেলে ফিরে এসে বাচ্চাদের ক্লাস। তারপর সন্ধ্যায় নিজের পড়াশোনা।'

'ভালোই তো চলছিল। তা আকাদেমি গেলি না কেন?'

'বৃন্দাবন দাস মানে আমার ওই মাস্টারমশাই আমার সামনেই মার্ডার হয়ে গেলেন।'

'বলিস কী? কী করে?' আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে রহমান।

'মাস্টারমশাই সি-বিচে অপারেট করা একটা আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রের হদিশ জেনে ফেলেন। তাই ওরা ওঁকে মেরে ফেলে আর দোষ হয়ে যায় আমার।'

'তোর দোষ মানে? তাহলে তুই এখন ফিউজিটিভ?'

'টেকনিক্যালি না।'

'খুলে বল।'

'যেহেতু আমি কলকাতায় মানুষ তাই নোমান আমার ডাকনাম। ভালো নাম হায়দার। ওই নামে যা যা কাগজপত্র ছিল, ছবি ছিল সব পুড়িয়ে ফেলে পালাই ওখান থেকে।'

'কোথায় পালিয়েছিলি?'

'প্রথমে কলকাতা।'

'মা তোমার নম্বর দিয়ে এখানে আসতে বলেছিল। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম শুধু শুধু তোমাকে ফাঁসিয়ে লাভ নেই।'

'তাই পালিয়ে গেলাম বাংলাদেশ। মাস ছয়েক ওখানে ছিলাম।'

'থাকতিস কোথায়?'

'একদম প্রথমে রেলস্টেশনে, তারপর একটা মসজিদে।'

'তারপর?'

'তারপর ওখানের এক এজেন্ট ধরে ভারতে ফিরে আসি। এখানে এসে পারভেজ নামে কাগজপত্র বানাই। তারপর একটা সিকিউরিটি এজেন্সিতে কাজে ঢুকি। ওরা বেসিক্যালি বিভিন্ন ভিভিআইপি-দের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে। আগে শুধু এয়ারগান চালাতে জানতাম এবার আসল বন্দুক চালাতে শিখি। ওরা আমাকে পাঠিয়ে দেয় দিল্লি। এক নেতার বডিগার্ড ছিলাম। সেই নেতা নেতাগিরির সঙ্গে সঙ্গে বেআইনিভাবে মানুষ পাচার করত বিদেশে। পাকিস্তানের থেকে আসা ড্রাগের বিজনেস করে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। আমাকেও বেশ কিছু ড্রাগ-ডিলে বডিগার্ড হিসাবে সঙ্গে থাকতে হয়েছে। বেশ কয়েকবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচিয়েছি।'

'তারপর?'

'একটা বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠিয়েছিল নেপালে। ওখানেই শেষ বছর তিনেক ছিলাম।'

'নেতা তো দিল্লিতে, তাহলে তুই নেপালে কাকে পাহারা দিচ্ছিলি?'

'নেতার ছেলেকে। সে নেপালে এমবিবিএস পড়ছে।'

'পড়া শেষ?'

'না। আরও এক বছর পড়লে শেষ হত। অবশ্য যদি পড়ার মতো অবস্থায় থাকত তবেই।'

'কেন? কী করেছিস ওকে?'

'না না। আমি কিছুই করিনি।'

'তাহলে?'

'ছেলেটার মেরুদন্ডে গুলি লেগেছে। রাতেই স্পেশ্যাল প্লেনে করে উড়িয়ে আনা হয়েছিল মুম্বাই।'

হঠাৎ করেই কথাটা শুনে দুজনেই সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে

জ্যানেট দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'তুমি কী করে জানলে?' শুধায় নোমান।

'আমাদের হাসপাতালেই তো ভরতি রয়েছে।'

নোমানের মুখটা ভয়ে শুকিয়ে যায়।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে জ্যানেট বলে, 'ভয় পেয়ে গেলে যে? গুলিটা তুমি চালিয়েছিলে?'

'না।'

'তাহলে?'

'ওর নাম হর্ষ বেনিওয়াল। একটা ডিল চলছিল। হর্ষ এর কাছে ছিল ড্রাগস আর অন্য একটা গ্রুপের কাছে ছিল টাকা। ডিল হবার কথা ছিল বিহারের রক্সৌল এর কাছে। কিন্তু কোনো কারণে কোনো এজেন্সির কাছে খবর হয়ে যায়। অ্যাম্বুশ হয়।'

'প্রচুর গুলিগোলা চলে। হর্ষের গুলি লাগে। মরে গেছে মনে করে আমি কোনোমতে পালাই।'

'কিন্তু ওরা ভাবছে টাকা আর ড্রাগস দুটোই তুমি নিয়ে পালিয়েছ।'

'তোমাকে কে বলল এসব কথা?'

'ওরা বলাবলি করছিল। আই ওভারহিয়ারড দেম।'

'টাকা বা ড্রাগস কোনোটাই নিয়ে পালানোর মতো পরিস্থিতি ছিল না জ্যানেট। ভারত-নেপাল যৌথ এজেন্সির অপারেশন। জীবন বাঁচানোটাই তখন প্রধান লক্ষ্য।'

'ওখান থেকে পালাই মধ্যপ্রদেশ। বিদিশায় লুকিয়ে ছিলাম কিছুদিন।'

'তারপর হুলিয়া বদল করে মুম্বাই। তবে এটা জানতাম না যে হর্ষ বেঁচে আছে আর মুম্বাইয়ে আছে।'

'চাপ নিয়ো না। মুম্বাইয়ে থাকবে না। একটু স্টেবল হলেই ওরা ওকে আমেরিকা শিফট করবে। ওখানের হাসপাতালের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।'

'যাক এবার একটু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম।'

'তা তুই এখন কী করবি কিছু ঠিক করেছিস?' প্রশ্ন করল রহমান।

'সেটাই তো ভাবছি।'

'এক কাজ কর। আমার পুরানো ট্যাক্সিটা চালা। বড়ো কোনো প্যাসেঞ্জার চড়বে না ওতে, ধরা পড়ার ভয়টাও থাকবে না।'